Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 09–17
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতে লোকজীবন : ছবি ও সংস্কৃতি

পুষ্পেন্দু নস্কর
গবেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল: puspendunaskar3@gmail.com

Keyword
বৈষ্ণব, সন্তজীবনী, লোকজীবন, লোকাচার, শিল্পকলা, কীর্তন, রন্ধনপ্রণালী, লক্ষ্মীকাচ, হিন্দু-মুসলমান, সম্প্রীতি

Abstract
বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্যভাগবত* ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থ দুটি বাংলা সংস্কৃতিচর্চার অতি মুল্যবান দুই গ্রন্থ। এই দুই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের দিব্যজীবন সাধক ভক্তের দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা হয়েছে। স্বভাবতই যে কোন ধর্মীয় বা অধ্যাত্মিক গ্রন্থে মানুষের বাস্তব জীবন হয় উপেক্ষিত। প্রাধান্য পায় সন্ত পুরুষের লীলাময় জীবন, যার অনেক ঘটনাই হয়তোবা ভক্তের অতিরঞ্জন। তাই জীবনীগ্রন্থে বর্ণিত সমস্ত ঘটনা সত্য নয়, তবে ভক্তও যেহেতু একজন মানব সেহেতু তিনি একেবারে দেশ, কাল, সমাজকে উপেক্ষা করতে পারেন না। তাঁর রচনায় সেই সময়ের মানুষের জীবনের ছবি উঠে আসতে পারে। *চৈতন্যভাগবত* ও *চৈতন্যচরতামৃতে* লোকজীবন খুব খুম পাওয়া যাবে কিন্তু যেটুকু পাওয়া যায় তার গুরুত্ব অপরিসীম।
আর বাঙালির আত্ম অন্বেষণে প্রাচীন বাংলার সমাজ কিংবা দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্ব কিরূপ তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তার 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থে। তাঁর কথায় -

> "দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবন, আমাদের প্রতিদিনের অশন-বসন, চলন-বলন, আমোদ-উৎসব, খেলাধুলা প্রভৃতি যে আমাদের মানুষ সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে, এ সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট সচেতন নয়। কোনো দেশ কালবদ্ধ নর নারীর মনন-কল্পনা, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা প্রভৃতি শুধু ধর্মকর্ম-শিল্পকলা-জ্ঞান-বিজ্ঞানেই আবদ্ধ নয় এবং ইতিহাসের মধ্যে শেষও নয়। জীবনের প্রত্যেকটি কর্মে ও ব্যবহারে শিলাচরন ও দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনচর্যার মধ্যেও তাহা ব্যক্ত হয়।"

চৈতন্যের সময়ে বাংলার সমাজ জীবন কেমন ছিল? বাংলার মানুষের আচার, খাদ্যাভাস, জীবিকা বা কিরকম ছিল? এসকল জানা ইতিহাসের দায়। সেই দায়বদ্ধতা থেকেই থেকে আমরা মূলত মধ্যযুগের বাঙালির সমাজ, ধর্ম, খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছেদ, শিল্প, দৈনন্দিন জীবন ও সংস্কৃতি আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি। এই সময় বাংলার সিংহাসনে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ উপস্থিত ছিলেন। তাকে নিয়েও বাঙালির কৌতূহলেরও অন্ত নেই। যার রাজত্বকালে বাংলায় শান্তি ফিরে আসে- এমনটাই দাবি করা হয়। এই সময়কালের বাংলার সাধারণ মানুষের জীবন যাপন সম্বন্ধে ইতিহাস সচেতন বাঙালির তাই কৌতূহল রয়েছে যথেষ্ঠ। মধ্যবাংলার অনেক গ্রন্থ থেকেই এই লোকজীবনের ছবি দেখানো

গেলেও চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলি অন্য তাৎপর্য বহন করে। সংসার জীবন প্রায় ত্যাগ করা বৈষ্ণব ভক্তরা সেই সংসার জীবন ও দেশ কালের ছবি তাদের গ্রন্থে ধরে রাখছেন– এ দৃষ্টান্ত যেহেতু বিরল তাই এর মূল্যও অপরিসীম।

Discussion

বাংলায় সন্তজীবনী লেখার সূত্রপাত মহাপ্রভুর প্রেমভক্তি আশ্রিত মহিমময় জীবন দিয়েই। এরপর বহু সন্তজীবনী লেখা হয়েছে। সেই সব গ্রন্থগুলিতেই মহামানবের জীবন উঠে এসেছে এক ঐকান্তিক ভক্তের দৃষ্টিতে। ভক্তি-স্তুতি ও নরচন্দ্রমা প্রভুর মহিমা কীর্তনই গ্রন্থগুলির মূল উপজীব্য। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই দেশ-কাল ও জনজীবনের প্রতিচ্ছবি এই গ্রন্থগুলোতে কমই পড়েছে। কিন্তু লোকজীবনচিত্রকে একেবারে বর্জন করতে পারেননি সেই সকল ভক্ত কবিরাও। কেননা দেশ-কাল ও সমাজকে বাদ দিয়ে সাহিত্য সংস্কৃতির কোন দিকই দাঁড়ায় না। সেই কারণে সন্ত জীবনীতেও কখনো কখনো উঁকি দিয়ে গেছে লোকজীবনের ছবি। ভক্তি স্রোতের মাঝেও জনজীবনের স্পন্দন টের পাওয়া গেছে। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থদ্বয় মহাপ্রভুর দিব্যজীবন, পরম ভক্তি ও অপার মহিমা কীর্তনের পাশাপাশি পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের বাংলার দেশ-কাল ও লোকায়ত জীবনকে সুন্দর রূপ দিয়েছে। এই দুই গ্রন্থ অবলম্বনে বাংলার সংস্কৃতির কিছু রূপ এখানে দেখানো গেল।

বাংলার সমাজচিত্র :

পঞ্চদশ ও ষোড়শ এই দুই শতাব্দী চৈতন্যের আবির্ভাব ও প্রেমভক্তি প্রচারের সঙ্গে যুক্ত। বাংলাদেশ তখন মুসলমান শাসনাধীন। বাংলার মসনদে তখন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ অধিষ্ঠিত (১৪৯৩-১৫১৯)। মুসলমান অধিকারে সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা তখন একটু কমতে শুরু করেছে। হিন্দু ও মুসলিমদের উভয় সম্প্রদায় পাশাপাশি বসবাস করছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিভেদও রয়েছে। এ বিভেদ কেবল হিন্দু মুসলমানের মধ্যে নয়, বৈষ্ণব-শাক্ত-ব্রাহ্মণ্যদের মধ্যে সমানভাবে বর্তমান। তাই দেখা যায় বৈষ্ণবদের নগরকীর্তনে মুসলমানরা যেমন ক্ষিপ্ত হয়েছে, তেমনি ক্ষিপ্ত হয়েছে শাক্ত ও ব্রাহ্মণ্য সমাজ। বলাই বাহুল্য, সমাজে জাতিভেদ প্রথা ছিল অত্যন্ত প্রবল। হিন্দু সমাজ মনু কিংবা রঘুনন্দনের কট্টর নিয়ম দ্বারা বাঁধা ছিল। সেই সময় মানুষের পেশা ও জাত ছিল মর্যাদা বিচারের অন্যতম মাধ্যম। বৃন্দাবন দাসের বর্ণনায় দেখা যায় নবদ্বীপে তন্তুবায়, গোয়ালা, গন্ধবণিক, শাঁখারী, তাম্বুলী- এরা প্রায় পাশাপাশি অবস্থান করছে। জাতের বিচারে এরা উচ্চবর্ণের নয়। আবার খোলাবেচা শ্রীধরের বাড়ি ছিল নগরের একেবারে শেষ প্রান্তে। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বাস থাকলেও তারা এদের থেকে দূরেই থাকত।

এক স্থানে বিশ্বম্ভর পার্ষদদের আদেশ দিচ্ছেন –

"নগরের অন্তে গিয়া থাকিহ বসিয়া।/ যে মোরে ডাকয়ে তারে আনিহ ধরিয়া।"[১]

অর্থাৎ চৈতন্যের ভক্তদের মধ্যে নগরের অন্তে বাস করা ব্যক্তি ছিল। চৈতন্যদেব নিজে জাতপাতের চরম বিরোধিতা করলেও অদ্বৈত আচার্যের মধ্যে এই জাতপাতের বিচার প্রবল ছিল। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের দ্বন্দ্বের একটা প্রধান কারণ ছিল এই জাতপাতগত সমস্যা। বৃন্দাবন দাস বহুবার তা উল্লেখ করেছেন,

"হেন জাতি নেই না খাইলা ঘরে ঘরে। / জাতি আছে হেন কোন জনে বলে তারে।।"[২]

এমনকি অবধূতের পাশে খেতে বসলেও অদ্বৈতের সঙ্কোচ ছিল প্রবল। কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন-

"জন্ম, কুল শীলাচার না জানি যাহার। / তার সঙ্গে এক পংক্তি বড় অনাচার।।"[৩]

তখন ধর্মের ভিত্তিতে সমাজ ছিল বহু বিভক্ত। তৎকালীন নবদ্বীপে হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য, বৈষ্ণব ও শাক্ত- এই তিন প্রকার ধর্ম সম্প্রদায়ের কথা পাওয়া যাচ্ছে। গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য সমাজ নব্যন্যায়, মীমাংসা, স্মৃতি, ব্যাকরণ ইত্যাদি নিয়েই মেতে ছিল। বৈষ্ণবরা ভক্তিমার্গ অবলম্বন করে বিষ্ণুর নাম-সংকীর্তনে রত ছিল। আর শাক্তপন্থীরা নানারকম শক্ত দেবীর যথা- মনসা, চন্ডী, বিষহরি প্রভৃতির পূজা করে জীবন কাটাচ্ছিল। বৃন্দাবন দাস এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বলেছেন-

> "ধর্ম-কর্ম লোকাচার এই মাত্র জানে। / মঙ্গলচন্ডীর গীত করে জাগরণে।।
> দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন। / পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন।।
> বাসুলী পুজয়ে কেহ নানা উপাচারে। / মদ্য মাংস দিয়া কেউ যক্ষ পূজা করে।।"[৪]

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বামাচার ও কামাচার প্রথা। দেখা যায় নবদ্বীপের সামাজিক অনুশাসন বেশ শিথিল হয়ে পড়েছিল এইসব কারণে। এখনকার মত তখনও একদল মানুষ– 'ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।' আবার, একশ্রেণির দরিদ্র মানুষের চালে খর জোগানো অন্তরায় হয়ে ওঠেছিল। হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের কথায়,

> "নৈতিক অধোগতিও দীর্ঘকাল ধরে হিন্দু সমাজকে গ্রাস করেছিল, অধোগতির চরম সীমায় উপনীত হয়েছিল বাঙালি সমাজ। তান্ত্রিক সাধনার ব্যাপকতার ছদ্মবেশে নর-নারীর ব্যাভিচার বিষাক্ত দুষ্ট ক্ষতের মত সমাজ দেহে প্রসারিত হয়েছিল। সহজিয়া সাধনার ছদ্মবেশে ধর্মের নামে নরনারীর ইন্দ্রিয় চর্চা ব্যাপকতা লাভ করেছিল।"[৫]

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের নবদ্বীপ ছিল বাংলার বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান। নবদ্বীপ নগরে পরিণত হয়েছিল। বহু জাতির মানুষ এখানে বাণিজ্য সূত্রে বসতি স্থাপন করেছিল। 'চৈতন্যভাগবত' অনুসারে,

> "নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।/ এক গঙ্গা ঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।
> ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।/ সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সভে মহা দক্ষ।।"[৬]

তখনকার বাংলার অর্থনীতির ভিত ছিল কৃষি। আবার নবদ্বীপ ও চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারও ঘটে। *চৈতন্যভাগবতের* 'গৌরাঙ্গের নগর ভ্রমণ' নামক অধ্যায়ে তন্তুবায়, গোয়ালা, গন্ধবণিক, মালাকার, তাম্বুলী, স্বর্নবণিক প্রভৃতি পেশায় নিযুক্ত মানুষজনকে দেখা গেছে। এদের কেউ কেউ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন থোড়, কলা, মুলা ইত্যাদি বেচে দিন গুজরান করতো। খোলাবেচা শ্রীধর এর বড় উদাহরণ। শ্রীধর চাষী ছিল, চাষের ফসল বেচে সে নিজের পেট চালাত। তাও তার দুবেলা ভাত জোটে না। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ্য সমাজ তার সম্বন্ধে বলেছে,

> "মহা চাষা ব্যাটা ভাতে পেট নাহি ভরে। / ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া রাত্রি জাগি মরে।।"[৭]

এই শ্রীধরের চাষ করা লাউ নিমাই খাওয়ার জন্য নিয়েছিল। চাষের কথা পাওয়া যাচ্ছে নিত্যানন্দ পিতা হাড়াই ওঝার বর্ণনায়। যেখানে বলা হয়েছে হাড়াই ওঝা পুত্র নিত্যানন্দকে ছেড়ে তিলমাত্র কোথাও যেতে পারেন না। কৃষিকাজ কিংবা যজমান ঘরে তাকে সঙ্গে রাখতে হয়। *চৈতন্যভাগবত* থেকে জানা যাচ্ছে, নিমাই জন্মাবার কিছু পূর্বেই বাংলায় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল খরার কারণে। কৃষকের অনেক ফসল নষ্ট হয়েছিল। কিন্তু নিমাই জন্মাবার পর এই দুর্ভিক্ষ ঘুচে যায়।

তখন বিনিময় প্রথার মাধ্যম ছিল কড়ি। নবদ্বীপে সমস্ত কিছু কেনা বেচা চলেছে কড়ির মাধ্যমে। বৃন্দাবনের 'কড়ি পাতি লগে কিছু নাহিক আমার' কিংবা 'প্রভু বলে কড়ি বিনা কেনে গুয়া দিলা' ইত্যাদি উক্তি থেকে বোঝা যায়। তখন মানুষ সকাল-সন্ধ্যা গঙ্গাস্নান করত। গঙ্গাস্নান কালে গঙ্গায় নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবরা প্রাত্যহিক কর্ম করে নিত। বাড়িতে ফিরে তিলক কেটে তুলসীবৃক্ষে তারা জল দিত। ব্রাহ্মণদের বাড়িতে শালগ্রাম শিলা পুজো হতো। জগন্নাথ মিশ্রের

বাড়িতেও এই শালগ্রাম শিলা ছিল। নবদ্বীপে ছিল বহু অধ্যাপকের বাস। এঁরা ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী, মিশ্র, আচার্য প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত হতেন। এঁদের অনেক ছাত্র থাকতো এবং ছাত্ররা গঙ্গাস্নানের সময় নিজেদের গুরুর উৎকর্ষ অপকর্ষ নিয়ে ঝগড়া মারামারিও করত।

অতিথি আপ্যায়নকে বাঙালি ঘরের একটি পূর্ণ কার্য বলে বরাবরই মনে করা হতো। জগন্নাথ মিশ্রের ঘরেও অতিথি এসেছিল একবার। জগন্নাথ ও শচী দেবী তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে ভোজনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। তখনকার দিনে গৃহস্থের বাড়িতে শিবের গায়েনরা এসে গান করে যেত। 'চৈতন্যভাগবতে' একস্থানে গঙ্গায় কল্লোল (কুলকুচি), দন্তধাবন, কেশ সংস্কার করার কথা পাওয়া যাচ্ছে। এমনকি অনাচারও গঙ্গায় করা হত এমনটা বলা হচ্ছে। সে যুগে মানুষের বাড়িতে শৌচাগার থাকতো না। প্রয়োজন মতো বাড়ির বাইরে গিয়ে মলমূত্র ত্যাগ করত। *চৈতন্যচরিতামৃত* থেকে জানা যায় যে কোনো বিশিষ্ট অমাত্য বাংলার সুলতানদের অপ্রীতিভাজন হলে তাকে বন্দি করা হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে তাকে 'বাহ্যকৃত' করবার জন্য বাইরে যেতে দেওয়া হত।[৮]

তখন নবদ্বীপে চোরের উৎপাত ছিল প্রবল। একধরনের চোরের কথা আছে যারা শিশুদের চুরি করত। নিমাই-এর বাল্যকালে দুজন চোর তাকে চুরি করে নিয়ে যায়। যদিও পরে প্রভুর মহিমায় তাকে তার নিজের বাড়িতেই নিয়ে তারা উপস্থিত হয়। সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁর *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল* বইতে যে 'বারবোসার বিবরণ' লিপিবদ্ধ করেছেন, সেখানে বলা হয়েছে যে একদল মুসলমান পৌত্তলিক বালকদের চুরি করে এবং তাদের নপুংসক বানায়। তারপর তাদেরকে পণ্য হিসেবে ইরানিদের কাছে বিক্রি করে। এরা সেখানকার স্ত্রীদের ঘরবাড়ির রক্ষক হিসেবে কাজ করে।[৯] বেশ বোঝা যায়, এদেরকে প্রথমে খোজা বানিয়ে তবেই সেই দায়িত্ব দেওয়া হত। তবে কেবল চোর নয়, ছিল জলদস্যুরও উৎপাত।

তখনকার কালের ঘর গৃহস্থালির সুন্দর সব চিত্র পাওয়া যায় এই দুই গ্রন্থে। মানুষ তখন কলার খোলায় ভাত খেতো। শ্রীধর সেই কারণে কলার খোলা বিক্রি করত। পিতলের বাতি ব্যবহার করা হতো তখন। চোকা, পিঁড়ি, লগুর, ইত্যাদির কথা আছে। তখন বাড়ির রান্নাঘরে শিকা টাঙানো হতো। তাতে তেল, নুন, চাল, ডাল ইত্যাদি রাখা হতো। যে যুগের বিবাহে বাগদান রীতি প্রচলিত ছিল। একবার বাগদান করার পর আর দ্বিমত করার উপায় ছিল না। বিদ্যানগরের সাক্ষী গোপালের বর্ননায় গিয়ে কবিরাজ গোস্বামী এমন একটি কাহিনি শুনিয়েছেন। কাহিনিতে এক বিপ্র অন্য এক বিপ্রকে কন্যা সম্প্রদানের কথা দিয়েছিল। পরে পরিবারের চাপে পড়ে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। আবার এর একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হল স্বয়ং নিমাইয়ের বিয়ে। যেখানে পাত্রী হিসেবে লক্ষীদেবীকে নির্বাচন করেন নিমাই নিজে।

কবিরাজ গোস্বামীর তত্ত্বে নিমজ্জিত বইটিতে খুব বেশি জনজীবন ছবি স্থান পায়নি। যেটুকু রয়েছে সেটুকুই একজন দক্ষ কবির গুণকে চিনিয়ে দেয়। গোস্বামীজী *চৈতন্যচরিতামৃতে-র* আদিলীলার দ্বাদশ পরিচ্ছেদে একটি উপমা প্রয়োগ করেছেন এইভাবে–

> "ধান্য রাশি মপি যৈছে পাতনা সহিতে।/ পাছে পাতনা উড়াইয়ে সংস্কার করিতে।"[১০]

এই পাতনা হল গরুকে ঘাস খাওয়াবার জন্য বড় 'নাদা' বা পাত্র। বাঙালি ঘরে ধান ঝাড়াই করে এহেন পাতনার সাহায্যে মাপা হয়। আবার ধান থেকে আখড়াকে আলাদা করার একটি উপায় হল পাতনা সমেত ধান দ্রুতগতি বাতাসের অভিমুখে ধরে নিচে ধীরে ধীরে ফেলা। বাতাসে আখড়া উড়ে গিয়ে আলাদা হলে ধান বস্তাবন্দি করা হয়। কবিরাজ গোস্বামী এই দৃশ্যটি চমৎকার ব্যবহার করেছেন। বাঙালি ঘরে ধান খামারে তোলা থেকে ঝারাই বাছা করা সবই নারী পুরুষ একসঙ্গে করে। আবহমান কাল থেকেই এ দৃশ্য চলে আসছে। এমনকি দ্বাদশ শতাব্দীতে সংকলিত *সদুক্তিকর্ণামৃত* এবং *সুভাষিতরত্নকোশের* সংস্কৃত শ্লোকেও ঠিক এমনই চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। অজ্ঞাতনামা এক কবি বলছেন-

> 'চাষিদের ঘর কেটে আনা ধানের স্তূপে সমৃদ্ধ। সংলগ্ন (জলাশয়ে) নীলোৎপলের সংযোগে নবপ্ররূঢ় শ্যামল যবাঙ্কুর ক্ষেত্রসীমাকে যেন দীর্ঘায়িত করছে। গাই-ষাঁড়-ছাগল (ঘরে) ফিরে এসে নতুন পোয়াল পেয়ে তৃপ্তি পাচ্ছে। গ্রামগুলি নিকটস্থ আখমড়াই-কলের শব্দে মুখর আর গুড়ের গন্ধে আমোদিত।"[১১]

সে যুগে ঔষধ হিসেবে বিভিন্ন টোটকার ব্যবহার ছিল। নিমাই গয়া থেকে ফেরার পর বায়ুগ্রস্থ হয়ে পড়লে মাথায় বিষ্ণুতৈল মর্দনের কথা রয়েছে। আবার মানুষের মধ্যে ডাকিনি, যোগিনী প্রভৃতি অতিলৌকিক ধারণায় বিশ্বাসের কথা পাওয়া যাচ্ছে কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থে। বাংলার উৎসবের মধ্যে পাচ্ছি শিশুর জাতকর্ম, উপনয়ন, বিবাহ, দোল, রথযাত্রা, এমনকি দুর্গোৎসবের কথাও রয়েছে। চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে যখন নবদ্বীপে বৈষ্ণব সংগঠন জোরদার হয় তখন তাদের নিজস্ব কিছু উৎসব পালনের কথা পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- মাধবেন্দ্র আরাধনা তিথি, অদ্বৈত্যের বাড়িতে এই মাধবেন্দ্র আরাধনা তিথি খুব জাঁকজমক ভাবে পালন করা হয়।

তখন বস্ত্র হিসেবে মূলত ধুতি পরার প্রচলন ছিল। মেয়েরা পড়ত শাড়ি। পুরুষরা সন্যাস নিলে কৌপিন বস্ত্র ধারণ করত। সেসময়কার বাংলার মানুষ পানীয় হিসেবে ব্যবহার করত মদ, নারকেলের জল, ইক্ষুরস, দুধ প্রভৃতি। চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ এবং প্রায় সমস্ত বৈষ্ণব সুরা পান করতো। এদের মধ্যে নিত্যানন্দের মদ্যাসক্তি ছিল প্রবল। তিনি মাতাল হয়ে উলঙ্গ নৃত্য পর্যন্ত করতেন। আবার সমাজে মাতাল জগাই-মাধাই এর মতো দুষ্কৃতিরাও ছিল। শাক্তরা মদ্যকে পূজার উপাচার হিসাবে ব্যবহার করত। বাংলায় আখ চাষ প্রচুর হতো, তা থেকে উৎপন্ন হতো গুড়। এই গুড় মদ তৈরির উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হতো। বারবোসা তার বিবরণীতে বাংলায় খুব ভাল জাতের সাদা চিনি তৈরির কথা বলেছেন। তিনি এও বলেছেন,

> "এই দেশে নানা রকমের মদ তৈরি হয়, প্রধানত চিনি আর তালগাছ থেকেই তা তৈরি হয়, এছাড়া অন্য অনেক জিনিস থেকেও হয়।"[১২]

বিচিত্র প্রকার খাদ্য ও রন্ধনপ্রণালীর উল্লেখ রয়েছে এই দুই গ্রন্থে। খাদ্যরসিক বাঙালির অজীর্ণ রোগ ছিল সর্ব সময়ের সঙ্গী তাও জানানো হচ্ছে। তাই দেখা যায় অবাড়ি গুপ্তের অন্য খেয়ে বিশ্বম্ভরের অজীর্ণ হয়েছে।[১৩] রন্ধনে বাংলা ও বাঙালির খ্যাতি ছিল। এই দুই গ্রন্থে বহু নিরামিষ পদের উল্লেখ রয়েছে। কবিরাজ গোস্বামী তাঁর গ্রন্থে বিচিত্র সব রন্ধনের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি কৃষ্ণলীলায় কস্তুরিকা মঞ্জুরী ছিলেন, সেখানে তাঁর রন্ধনশালার দায়িত্ব ছিল। তাই হয়ত এত সুন্দর করে রন্ধনের বিবরন দিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থ থেকে একটু তোলা গেল-

> "মধ্যপাত ঘৃত সিক্ত শাল্যন্ন স্তূপ। / চারিদিকে ব্যঞ্জন ডোঙ্গা আর মুগসূপ।।
> বাস্তক শাক পাক বিবিধ প্রকার। / পটল কুষ্মাণ্ড বড়ী মানকচু আর।।
> চই মরিচ সূক্তা দিয়া সব ফল মূলে। /অমৃতনিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে।।
> কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্ত্তাকী। / ফুলবড়ি ভাজা আর কুষ্মাণ্ড মানচাকী।।
> নারিকেল-শস্য ছানা সঙ্গরা মধুর। / মোচাঘন্ট দুগ্ধকুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর।।...
> মুদগবড়া মষবড়া কলাবড়া মিস্টান্ন। / ক্ষারপুলি, নারিকেল যত পিঠা ইষ্ট।।"[১৪]

এই দুই গ্রন্থ থেকে বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশের সুদর চিত্র পাওয়া যায়। নদী-নালা, বন-জঙ্গল পূর্ণ পান্ডব বর্জিত এ দেশে সাপ বাঘ কুমিরের ভয় ছিল। নদীতে ছিল জলদস্যুদের উৎপাত। নীলাচলের পথে নৌকার মাঝির কথায়-'নিরন্তর এ পানিতে ডাকইত ফেরে।' গাছের মধ্যে আম, জাম (জাম্বির) অশ্বত্থ, কদলী, ভেরেন্ডা, নলখাগড়া প্রকৃতির কথা উল্লেখ রয়েছে। 'রায়'এর অশ্বত্থ গাছ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এখানে তিনি সুন্দর গাভীদের দেখেও আবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন।

লোকাচার :

চৈতন্য সমসাময়িক বাংলায় যেসকল লোকাচার ছিল তার কিছু নিদর্শন রয়েছে এই দুই গ্রন্থে। শিশুর জাতকর্ম, অন্নপ্রাশন, বিবাহ ও মৃত্যু পরবর্তী শ্রাদ্ধ কার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল নান লোকাচার। শিশুর জন্মের পর জাতকর্ম করা হত। ওই দিন নর্তক, বাদক, ভাট এসে নাচগান করত। ধান, দূর্বা, গোরোচন, হরিদ্রা, কুমকুম, চন্দন ও সঙ্গে সোনা রুপোর নানা অলঙ্কার দিয়ে আশীর্বাদ করা হত। যথাসময়ে বালক উত্থান নামকরণ প্রভৃতি হত। নামকরণের সময় ফ্যান, পুঁথি খড়ি স্বর্ণ রজত গীতা, ভাগবত প্রভৃতি সামনে রাখা হত। বালক যেটি আগে ধরতো সেটিকে তার ভবিষ্যৎ বলে ধরা হত। একটু বড় হলেই বর্ণভেদ ও চুড়াকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হত।

বিবাহের রীতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা আছে। সেযুগে পাত্রকে যৌতুক বা পণ দেবার প্রথা ছিল। নিমাইয়ের বিয়ের সময় বল্লভাচার্য মাত্র পঞ্চ হরীতকী দিয়ে কন্যা সম্প্রদান করলেন। শুভদিনে শুভ লগ্নে অধিবাস হল। বিয়ের দিন সকালে নিমাই বিশ্বম্ভর স্নান ও দান ধ্যান করত। এয়োদের ঘট, কলা, সিঁদুর, পান ও তেল দিয়ে সন্তুষ্ট করা হত। হিন্দু বিবাহ রীতি অনেকটাই এখানকার কালের মতোই ছিল। তবে ড. সুখময় মুখোপাধ্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক দেখিয়ে দেন। তিনি বলেন এই বিবাহে কোথাও খাওয়ার বর্ণনা নেই। তখনকার কালে বিবাহে ভোজের বন্দোবস্ত থাকতো না। শচীদেবী ব্রাহ্মণদের যে ভোজ্য ও বস্ত্র দিয়ে সন্তুষ্ঠ করেছেন তা আসলে কাঁচা বস্তু। এখানে বিবাহের লোকাচার একটু তোলা গেল-

> "চতুর্দিকে নানা বর্ণে উড়িয়ে পতকা।/ কদলক রোপি বান্ধিলেন আম্রশাখা।।
> তবে আই প্রতিব্রতাগণ লই সঙ্গে।/ লোকাচার করিতে লাগিলা মহারঙ্গে।।
> তবে খই কলা, তৈল, তাম্বুল সিন্দুরে।/ দিয়া পূর্ণ করিলেন স্ত্রীগণেরে।।"[১৫]

বিষহরী, চণ্ডী প্রভৃতি শাক্ত দেবদেবীর সাধকগণ সমাজকে ত্রস্ত করে তুললেও বৈষ্ণবরা ছিল শান্ত ও নমনীয়। প্রত্যহ গঙ্গা পূজা তৎকালীন নবদ্বীপের মানুষের আচারের মধ্যে পড়ত। গৃহে থাকতো শালগ্রাম শিলা। গঙ্গাস্নান করে বিষ্ণুপুজা করে তুলসীবৃক্ষে জল দিয়ে তবেই মানুষ ভোজন করতো। নবদ্বীপের কুমারী মেয়েরা উত্তম পতিলাভের আশায় গঙ্গাতীরে মাটির শিব মূর্তি গড়ে পুষ্প চাল কলা ইত্যাদি দিয়ে পূজা করতো। মানুষের মৃত্যুতে যেসকল আচার অনুষ্ঠেয় হত তার বিস্তারিত বর্ণনা মধ্যযুগের কোন কবিই সেভাবে দেননি। তবে মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান পালন করা হত। জাতিভেদে অশৌচের দিন আলাদা আলাদা হত। এছাড়া গয়ায় গিয়ে পিণ্ডদান রীতিও প্রচলিত ছিল। জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যুর পর নিমাই গয়ায় গিয়ে তাঁর পিণ্ড দেন। বর্তমান কালে এ সমস্ত লেকচারের তেমন কোন পরিবর্তন হয়েছে তা বলা যায় না।

শিল্পকলা :

তখনকার সময়ে শিল্পের মধ্যে উপস্থাপনমূলক শিল্প যথা- কীর্তন, নাটক, রূপসজ্জা ইত্যাদির প্রচলন ছিল। লীলাকীর্তন ও পালাকীর্তন দুইই প্রচলিত ছিল। কীর্তনে নৃত্য ছিল একটি বিশেষ অঙ্গ। রমাপদ চক্রবর্তীর মতে কীর্তন স্রষ্টা জয়দেব ও তাঁর স্ত্রী নর্তক ছিলেন।[১৬] শ্রীচৈতন্যের কীর্তন গানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নৃত্যও। কেবল নাম সংকীর্তনই নয়, পদ গানেরও রেওয়াজ ছিল সেই সময়। মুকুন্দ, মাধব ঘোষ কীর্তন গানের নামী শিল্পী ছিলেন। কেমন ছিল সে সময়কার কীর্তন? খগেন্দ্রনাথ মিত্রের কথায়–

> "বহু খোল-করতাল একসঙ্গে বাজিতেছে, বেহালা, বাঁশি প্রভৃতি অন্য যন্ত্রও হয়ত আছে ...শ্রোতা ও গায়ক অশ্রু সমাকুল কণ্ঠে ভগবানকে আহ্বান করিতেছেন ...আর গায়ক আর শ্রোতা পরস্পরের সত্ত্বা ভুলিয়া উদ্দাম নৃত্য করিয়া পরিশেষে ভাবাবেশে ভুলুণ্ঠিত হইতেছেন - ইহাই নামসংকীর্তনের স্বাভাবিক একটি দৃশ্য।"[১৭]

তখন ডঙ্ক' নৃত্য বলে একপ্রকার নৃত্যের অস্তিত্ব ছিল। সর্প সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ছিল এই ডঙ্ক নৃত্য। এখানে নাগরাজের মন্দিরে 'ডঙ্ক' নিত্য করার কথা আছে। হরিদাস ঠাকুরও এই নৃত্যে অংশ নিয়েছিলেন।

সেই সময় বাংলায় নাট্যশালার উপস্থিতির কথা জানা যায়। বৃন্দাবন দাস তাঁর গ্রন্থে 'কাহ্নাঞির নাটশালা' বলে একটি গ্রামের উল্লেখ করেছেন। এখনকার কালের লোকনাট্যের ন্যায় চৈতন্য সমসাময়িক কালেও একটি নাট্যধারা প্রচলিত ছিল। 'লক্ষীকাচ' নৃত্যের যে শিল্প নিদর্শন বৃন্দাবনদাস ও কবিরাজ গোস্বামী দেখিয়েছেন, তা বাংলায় পূর্বে প্রচলিত ছিল কিনা ঠিক জানা যায় না। চন্দ্রশেখরের গৃহে একদিন কীর্তনাদি হবার পর হঠাৎ চৈতন্যদেব বলেন, 'আজি নৃত্য করিবাঙ অংকের বিধানে'। অংকের বিধানে মানে নাট্যের আকারে। কবিরাজ গোস্বামী একে বলেছেন 'কৃষ্ণলীলা। এখানে গদাধর সাজেন রুক্মিণী, ব্রহ্মানন্দ তার বুড়ি সখি, নিত্যানন্দ বড়াই, হরিদাস কোতোয়াল, শ্রীবাস নারদ এবং চৈতন্যদেব স্বয়ং লক্ষীবেশ সাজেন। এদের কাচ (সজ্জা) করানোর ভার পড়ে বুদ্ধিমন্ত খানের উপর। শখ, কাঁচুলি, পাঠ, শাড়ি অলংকার প্রভৃতি ব্যবহার করে সকল চরিত্রগুলির চমৎকার সজ্জা গ্রহণ করে নেয়। এঁরা নিজেদের অভিনয় দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলে। এই নৃত্যের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখে সমালোচক নির্মলেন্দু ভৌমিক 'চৈতন্যদেব ও লোকমানস' প্রবন্ধে একে লোকনাট্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলেছেন। এর বৈশিষ্ট্যগুলি হল- (১) এই অভিনয় এর মধ্যে নৃত্য একটি প্রধান দিক ছিল (২) কাচ বা রূপসজ্জা গ্রহণ করা হয়েছিল। (৩) রূপসজ্জার মধ্যে সং ধর্মী বিশেষত্ব লক্ষণীয়। (৪) পুরুষগণ ও নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। (৫) এতে সংস্কৃত নাটকের মতো হরিদাস নাটকের মূল বিষয় বর্ণনা করেছে। যদিও কোন লিখিত নাটকের অভিনয় করা হয়নি। (৬) এই নাটক 'impropture' ছিল। (৭) বড়াই ,সখি ,পাত্র প্রভৃতি সামাজিক চরিত্র এতে অংশ নেয়।[১৮]

এই দুই গ্রন্থে বস্ত্রশিল্প ও নৌকা নির্মাণ শিল্পের কথা রয়েছে। তবে চৈতন্যদেব পূর্ববঙ্গ থেকে নানা দ্রব্যের সঙ্গে বস্ত্রও এনেছিলেন তা বলা হচ্ছে। তখনকার চট্টগ্রাম ছিল বস্ত্রশিল্পের বিখ্যাত স্থান। নৌকানির্মাণ শিল্পের কথা না থাকলেও ভেলা তৈরির কথা বারবার কথিত হয়েছে। বাংলায় কলা গাছের অভাব না থাকায় ভেলা তৈরি ছিল মানুষের কাছে সহজসাধ্য। তাছাড়া এতে বাঁশও কাজে লাগানো হত। ভেনিসীয় বণিক 'নিকালো কন্তি' পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে ভারতে আসেন। তিনি তাঁর বর্ণনায় বলেছেন-

> "স্থল ও জলপথে বহু ভ্রমণ করে তিনি (নিকালো) গঙ্গা নদীর মোহনায় এসে পৌঁছালেন। ...এই নদীর তীরে খুব লম্বা লম্বা নলখগড়া (বাঁশ) জন্মায়। এগুলি দিয়ে তারা (বাঙালিরা) জলে নৌকা তৈরি করে। ...হাতের চেতর চেয়ে একটু চওড়া কাঠ বা বলকল দিয়ে তারা নদীর বুকে চলা ফেরার জন্য ডিঙ্গি বানায়।"[১৯]

এই দুই গ্রন্থের বহু স্থানে এই 'ভেলার' বর্ণনা পাওয়া যাবে। এছাড়াও বিভিন্ন লোকশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায় যেমন, পিঁড়ি, টোকা, আসন, শিকা, পাথরের সিংহাসন, ঘরের আলপনা প্রভৃতি। 'আপনে টোকায় শাক তুলিতে লাগিল'- এই টোকা হল তালপাতা দিয়ে তৈরি ক্ষুদ্র পাত্র যা চুরির কাজ করতো। 'লক্ষ্মীদেবী অনিল আসনে ধরিয়া'- বিয়ের সময় এই বর-বধূর আসনগুলিতে মেয়েরা নানা রকম নকশা তৈরি করত। এছাড়া পাথরের সিংহাসন ও পিঁড়িতে নানারকম কারুকার্য করা হত।

মাটির ঘর ছিল বাংলার হস্তশিল্পের একটি সাধারণ বিষয়। চৈতন্যের সময়ে নবদ্বীপে কিছু হয়ত পাকা বাড়ি ছিল। চার চালা রীতির মাটির ঘর ছিল। ছাওন হিসেবে খর ব্যবহৃত হত। বৃন্দাবন দাস শ্রীধরের গৃহের বর্ণনায় বলেন–

> "প্রভু বোলে দেখিলাঙ গাঁঠি দশ ঠাঞি / ঘরে তোর এই দেখিতেছি খড় নাহি।।"[২০]

গৃহ ছাড়া চন্ডীমন্ডপ, নাটমন্ডপ এর কথাও এই দুই গ্রন্থে রয়েছে। এগুলি দোচালা কিংবা চারচালা রীতির হত। খর দিয়ে তৈরি কুটির খ্যাতি অর্জন করেছিল। তারাপদ সাঁতরা বলেছেন-

> "দোচালা বা চার চলা রীতির চন্ডীমন্ডপ...এবং নাটমন্ডপ নির্মাণে বাঙালি বস্তু শিল্পীরা অসামান্য কুশলতার নিদর্শন রেখে গেছেন। একদা গৌর বাংলার স্বাধীন সুলতানরা এই খড়ো ঘরের রূপসৌষ্ঠবে মোহিত হয়েছিলেন, তাই প্রথাগত ইসলামী স্থাপত্যধারা গ্রহণ না করে তাঁরা তাঁদের ধর্মীয় স্থাপত্যে এই খড়ো কুটিরের আদল এনেছিলেন।"[২১]

লক্ষণীয়, শিল্পের মধ্যে ধর্ম সমন্বয়ের দিকটি কখনই এড়িয়ে যাবার নয় । সে যুগের হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক খুব তিক্ত ছিল তা হয়ত নয়। যবন হরিদাস, কিংবা শ্রীবাসের ঘরের মুসলমান দরজী বৈষ্ণব ভাবধারার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন। গোটা মধ্যযুগের ইতিহাসে ধর্মসমন্বয়ের দিকটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রণিধানযোগ্য। নিবন্ধ শেষ করা যায় গবেষক জগদীশ নারায়ণ সরকারের বক্তব্য দিয়ে। তিনি বলেন,

> "...এই দুই সম্প্রদায়ের প্রবল ধর্মীয় বৈপরীত্য ও সামাজিক স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও ধীরে ধীরে তাহারা নিকটতর হইতে ছিল। কোন কোন সুলতান বা শাসক এবং মোল্লা, উলেমা অবশ্য গোঁড়ামিতে ইন্ধন দিয়াছেন। কিন্তু মুসলমান যুগের প্রাথমিক জিহাদ, রক্তপাত, অত্যাচার, অসহিষ্ণুতা চিরস্থায়ী হয় নাই।"[২২]

অর্থাৎ পঞ্চদশ ষোড়শ শতকের বাংলার জনজীবন মুসলমান শাসনের মধ্যেও নিজেকে সচল রেখেছিল। সংস্কৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ সহাবস্থান সেখানে বর্তমান ছিল। চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে সমাজ একটি নব্য জীবনধারার স্রোতে বয়ে চলতে শুরু করেছিল।

তথ্যসূত্র :

১. দাস, বৃন্দাবন, *চৈতন্যভাগবত,* বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা: ১৯৯৫, পৃ. ১২৬
২. তদেব, পৃ. ৬০
৩. কবিরাজ, কৃষ্ণদাস, *চৈতন্যচরিতামৃত,* উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ১৮৪
৪. দাস, বৃন্দাবন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২
৫. ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ, *যুগবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,* ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ৪০
৬. দাস, বৃন্দাবন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২
৭. তদেব, পৃ. ১৬৮
৮. মুখোপাধ্যায়, সুখময়, *ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল,* দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৮, পৃ. ৫১২
৯. তদেব, পৃ. ৪৯৭
(তবে এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় হল নবদ্বীপের এই দুই চোর মূলত শিশুর অঙ্গের অলংকারের লোভে চুরিটা করে, 'প্রভুর শ্রী অঙ্গে দেখি দৈব অলঙ্কার।/ হরিবারে দুই চড়ে চিন্তে পরকার' তাকে মুসলমানের ঘরের ভৃত্য বানাবার উদ্দেশ্য তাদের হয়ত ছিল না। কিন্তু প্রভুর ময়াজালে আবদ্ধ হয়ে বাড়িতে না ফিরতে পারলে, ঐ দুই চোর শিশুটির সঙ্গে কি করতো সেটাই বিবেচিত হয়েছে।)
১০. কবিরাজ, কৃষ্ণদাস, *চৈতন্যচরিতামৃত,* সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লী, পৃ. ৫৯
১১. সেন, সুকুমার, *বঙ্গ ভূমিকা,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, মে ১৯৯৯, পৃ. ১৭০
১২. মুখোপাধ্যায়, সুখময়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১২
১৩. দাস, বৃন্দাবন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩০

১৪. কবিরাজ,কৃষ্ণদাস, *চৈতন্যচরিতামৃত,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯
১৫. দাস, বৃন্দাবন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬
১৬. চক্রবর্তী, রমাপদ, *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম,* আনন্দ , কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ১৫১
১৭. মিত্র, খগেন্দ্রনাথ, *কীর্তন,* বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, আষাঢ় ১৩৫২, পৃ. ৭
১৮. সান্যাল, অবন্তীকুমার, ভট্টাচার্য, অশোক সম্পাদিত, *চৈতন্যদেব ইতিহাস ও অবদান,* সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০০২ পৃ. ৩১
১৯. মুখোপাধ্যায়, সুখময়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৫
২০. দাস, বৃন্দাবন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬
২১. সাঁতরা, তারাপদ, *পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পী সমাজ,* লোকসংস্কৃতি, আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা ২০১০, পৃ. ১
২২. সরকার, জগদীশ নারায়ণ, *বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক',* (মধ্যযুগ), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা : ১৪০০, পৃ. ২৬